



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 43-49

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.503



‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র নিরিখে নারীর আত্মজাগরণ

রিয়্যা পাল, সহকারী অধ্যাপক, কোকরাঝাড় বিশ্ববিদ্যালয়, কোকরাঝাড়, অসম, ভারত

Received: 20.09.2026; Accepted: 28.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Many female authors have significantly enriched the realm of Bengali fiction through their literary contributions. Ashapurna Devi stands out as a prominent figure among them. Her novel ‘Pratham Pratishruti’ is particularly noteworthy. In this work, the novelist articulates the intense yearning for self-liberation that awakens within a woman – a desire born from the hardships endured over generations due to social inequality and a lack of awareness regarding self-identity and the meaning of life.

The objective of this paper is to explore the themes of women’s liberation by examining the female characters created by Ashapurna Devi – specifically the protagonist, Satyabati, and her life’s struggles. Through Satyabati’s journey, the author seeks to address broader issues concerning the emancipation of women. The novel is analyzed here from a feminist perspective, focusing on key events within the narrative. The discussion highlights various social issues of the era, such as superstition, gender discrimination, women’s education, self-respect, independent thinking, and the development of individual identity. By virtue of her nature, Satyabati emerges as a unique and exceptional character in the society of her time. Her struggle was not confined to her personal life alone; rather, she became a symbol of dignity and rights for all women. Consequently, ‘Pratham Pratishruti’ is regarded as a seminal novel in Bengali literature regarding women’s liberation and the awakening of women.

Keywords: Character of Satyabati, women’s awakening, self-awakening, women’s education, women’s emancipation.

‘নারী’-দুটি বর্ণ মিলে তৈরি একটি শব্দ যা যুগ যুগ ধরে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। মানব সভ্যতার অন্যতম প্রতীক হিসেবে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। একটি শিশুর জীবনের মানবতার পাঠ শুরু হয় নারীর কোমল স্পর্শে। ‘মা’ নামক বিচিত্র, অদ্ভুত, নিঃস্বার্থ সেবিকা তার গর্ভে ধারণ করে তার সন্তানকে এবং পৃথিবীর আলো দেখার ও উপভোগ করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়ে দেয়। শুধুমাত্র জন্মদায়িনী মাতা হিসেবে নারী রয়ে যায়নি বা থেমে যায়নি, নারী সমাজ ও পরিবারের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছে। সন্তানের প্রথম শিক্ষক ও তার মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মূল চালিকা নারী। রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ।

ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবী ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নারীর এই নতুন স্বত্ত্বার অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীর দৃঢ় প্রতিবাদ উপন্যাসটির এক নতুন দিক উন্মোচন করে। ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমের সময়সীমানার অন্তঃপুরের ভাঙ্গা-গড়া কাহিনির মধ্যদিয়ে সত্যবতী জীবন্ত হয়ে রয়ে গিয়েছে ইতিহাসের পাতায় উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।

নারীমুক্তি ও নারীজাগরণের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের সেরা উপন্যাস আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত গৃহবন্দী নারীরা নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া সব বিসর্জন দিয়ে রক্ষণশীল সমাজে নিজেদের কাঠের পুতুলের মত খাপ খাইয়ে নিতো- এই ধরনের অবস্থার ওপর ঔপন্যাসিক মুক্তির পথপ্রদর্শক হিসেবে সত্যবতী চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। সমাজের মধ্যে নারীদের বেঁচে থাকার সত্ত্বাকে জীবন্ত করে তুলেছেন লেখিকা তাঁর নিখুঁত লেখনীর মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের শুরুতেই ভূমিকা অংশে স্বয়ং লেখিকা লিখেছেন- ‘বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের, যুগের, সমাজ মানুষের মানসিকতার। চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভূতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।

তুচ্ছ দৈনন্দিনের পৃষ্ঠপটে আঁকা এই ছবি যদি বহন করে রাখতে পেরে থাকে বিগত কালের সামান্যতম একটি টুকরোকে, সেইটুকুই হবে আমার শ্রমের সার্থকতা।’

ঊনবিংশ শতকের সমাজ ছিল মূলত পুরুতান্ত্রিক। পুরুষের ইচ্ছার-স্বেচ্ছার অধীন ছিল নারীর জীবন। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই নারীকে সর্বদা কৈফিয়তের শিকার হতে হতো। এহেন সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা, অবস্থান, পরিচয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত পরিবারের পুরুষদের উপর। বিয়ের আগে বাবা-ভাই ও বিয়ের পর স্বামী-ছেলেদের তত্ত্বাবধানেই নারীর জীবন অতিবাহিত হতো। তৎকালীন সময়ের নারীর প্রথমও প্রধান সম্বল ছিল গৃহ এবং দায়িত্ব ছিল সংসার পরিচালনার, পরিবারের সেবার ও সন্তান লালন-পালনের। নারীর ব্যক্তিসত্ত্বা, ইচ্ছা- আকাঙ্ক্ষা এইসবকে অতিক্রম করে নারীকে তুলনা করা হতো তুচ্ছ বস্তুর ন্যায়। সত্যবতীর পিসির ছেলে জটার স্ত্রীর মধ্য সেই রক্ষণশীল সমাজের অবহেলিত নারীর চিত্র ফুটে উঠে-

‘রান্নাবান্না সেরে যেই খেতে বসেছে জটাদার বৌ, আর অমনি জটাদা পান চেয়েছে। জটাদার বৌ বলেছে ‘পান ফুরিয়ে গেছে’, ব্যস, বাবু মহারাজের রাগ হয়ে গেছে। দিয়েছেন ঠাই ঠাই করে পিঠের ওপর লাথি। আর অমনি জটাবৌঠান কাঁসিতে মুখ খুবড়ে’^১

সেই লাথি খেয়ে নিরপরাধী বউ একেবারে গড়িয়ে উঠোনে তুলসী তলার কাছে এসে পড়েছিল। অবহেলিত সমাজ সেই মৃত্যু আসন্ন নারীর উপরই দোষের আঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল। মৃত্যু যখন নিকটস্থ তখন সেই মুহূর্তে সত্যবতী এসে দাঁড়িয়েছিল জটার বউয়ের পাশে। নারী যে এতটাই ভীত বা সমাজব্যবস্থা তাকে এতই নাজেহাল বানিয়ে দেয় যে সেই জটার বউ যখন পুনরায় জীবন লাভ করে তখন অতি সহজেই সে তার স্বামীকে মাপ করে দেয় এবং পুনরায় তার স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি মানুষের শারীরিক অসুস্থতার অন্যতম উপায়, ওষুধ যা তৎকালীন সমাজের নারীর কাছে তা সেবন একটি দীর্ঘতম অপরাধের সমান ছিল। এই সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্যবতী জটার বউর অসুস্থতার জন্য ওষুধ

যোগাড় করে দিলেও তা সে সেবন করতে দ্বিধাগ্রস্ত কারণ অসুস্থতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরিবারের সম্মতি, যা জটীর বউয়ের কাছে ছিল দুঃসাধ্য- ‘শাশুড়ির অসাক্ষাতে ওষুধ খাবার সাহস তার নেই, বলেকয়ে সাক্ষাতে খাবার তো আরোওই নেই,’^৩ -সেই সমাজে মহিলাই ছিল মহিলার বৃহৎ শত্রু।

আত্মমুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধান ও প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার অবিহনে আত্মমুক্তি লাভ করা প্রায় শোচনীয়। সত্যবতীর জীবন পরিবর্তনের মূলেই যা রয়েছে তা তার স্বভাব ও দ্বিতীয় শিক্ষা। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের পড়াশোনা একেবারে কল্পনার অতীত ছিল, এমনকি তাদের শিক্ষার ব্যাপারে সমাজব্যবস্থা এতটাই অবনত ছিল যে মেয়েরা নাকি তালপাতাতে হাত দিলেই তাদের চোখ অনায়াসে কানা হয়ে যায়-তবুও সত্যবতী হার মানেনি। সে উপলব্ধি করে শিক্ষা শুধু সার্টিফিকেট-এ রয়ে যায় না, প্রকৃত মানুষ হতে হলে বিচারবোধ, স্বাধীনচিন্তা অত্যন্ত প্রয়োজন, যা কেবল শিক্ষাই দিতে পারে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে পুরুষশাসিত সমাজের ছোট্ট শিশু নেডু ওস্তাদের মানসিকতার মধ্য দিয়ে তা প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠে- ‘ভগবান বলে দিয়েছে ভালো কাজগুলো ব্যাটা ছেলেরা করবে খারাপ কাজগুলো মেয়েমানুষেরা করবে,’^৪ অর্থাৎ শিশুকাল থেকেই প্রত্যেকটি শিশুর মনে এই মানসিকতা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে পুরুষ শাসিত সমাজের নারীরা হয়ে থাকে কাঠের পুতুলের মত। যে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তাদের নিজেদের প্রয়োজনের উপযোগী করে তোলে। কিন্তু এইখানে এসে সত্যবতী এক নতুন দিক উন্মোচন করে। সে সেই সমাজের চিরাচরিত ঐতিহ্যকে পুরোপুরিভাবে পাল্টে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। সে তৎকালীন সমাজের চিন্তাধারার উর্ধ্বে গিয়ে লেখাপড়া শিখে এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আঙুলি নির্দেশ করে। তাকে বেশ মজার ছড়া রচনা করতে দেখা যায়। যেমন জটা সম্পর্কিত একটি ছড়া উপন্যাসে হাসির দাবি অর্জন করেছে-

“জটা দাদা পা গোদা
যেন ভোঁদা হাতি,
বৌ-ঠেঙানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারে লাথি।
জটা জটা পেট মোটা-
ভাত মারবার ধাড়ি,
দেখবো মজা, কেমন সাজা
যাও না শ্বশুরবাড়ি।”^৫

নারীর অধিকার, অবস্থান, নারীর প্রতি থাকা বিদ্যমান বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায় একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে, যার দরুন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অযৌক্তিক নীতি-নিয়মকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করে দূর করা যায়। মানুষের মূঢ়তা বা অজ্ঞতা মানুষকে পরাধীনতার বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখে এবং মানুষকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয় অপরদিকে প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচার, চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করিয়ে দেয়। সেই জন্যই শিক্ষাকে নারী মুক্তির অন্যতমমূল চাবিকাঠি দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক সত্যবতীর মধ্য দিয়ে। শিক্ষিত নারী কেবল নিজের জীবনেরই পরিবর্তন আনেনা বরং পরিবার সমাজ, সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করে থাকে। সত্যবতীর মধ্য দিয়ে কেবল ঔপন্যাসিক তৎকালীন সমাজের নারী জাতির উন্নতির দিক উন্মোচন করেননি বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও সত্যবতী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করেছে।

নারী জাগরণের যে ভাব আমরা আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে ফুটে উঠতে দেখি তা কেবল সত্যবতীর চরিত্রের মধ্যেই থেমে রয়ে যায়নি বরং তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য নারী চরিত্রের সার্বিক উন্নয়ন আমরা দেখতে পারি। বাবার একমাত্র কন্যা হয়েও সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থার জন্য বাল্যবিবাহ থেকে নিস্তার পায়নি এবং এটি তার জীবনে খুব শোচনীয় একটি অবস্থা। যেইসময়ে একটি মেয়ে খেলবে, খাবে, পড়াশুনা করবে সেইখানে প্রতিনিয়তই তাকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা শুনতে হতো বিশেষ করে মোক্ষদার থেকে। উনিশশতকে দাঁড়িয়ে যেখানে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করাটা দুঃসাধ্য ব্যাপার; যা সমাজ মনে করে নারীর জন্য তা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ও অনুচিত বলে বিবেচিত। সমাজ বাস্তবতার এই ব্যাপারটির থেকে হার মানেনি সত্যবতী, সে উপলব্ধি করে শিক্ষা শুধু সার্টিফিকেটে রয়ে যায় না বা অক্ষর জ্ঞান মাত্রই হয়ে থেমে যায় না, প্রকৃত মানুষ হতে হলে বিচার বোধ, স্বাধীন চিন্তা, আত্মসচেতনতাবোধ ইত্যাদির অত্যন্ত প্রয়োজন যা একমাত্র শিক্ষাই দিতে পারে। তাই সে নানান কুসংস্কার, সমাজের মানসিকতা ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে বাবার কাছে পড়াশোনা আগ্রহ প্রকাশ করে। একমাত্র মেয়ের ইচ্ছাকে বাবা মরে যেতে দেয়নি, বাবাই তার জীবনের প্রথম শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। তবে, সত্যবতী চরিত্রের যে গাম্ভীর্য ও সাহসিকতা তা তার চরিত্রে বাল্যকাল থেকেই ছিল। তাই পরিবারের সকলের চিন্তার নিঃশেষ ছিল না। সকলেরই সবসময় ভয় ছিল বিশেষ করে মা ভুবনেশ্বরীর যে তার একমাত্র কন্যার এহেন আচরণের জন্য স্বামীর ঘর থেকে যাতে বিতাড়িত হতে না হয় এবং এর জন্যই মেয়ের শিক্ষার কথা শুনে তার দুচোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা বয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে যে বাস্তবতা ফুটে উঠে তা থেকে বোঝা যায় সেই সময়ের সবচেয়ে উপেক্ষিত, অবহেলিত জায়গা যদি কিছু ছিল তবে তা অন্তঃপুরের ভাঙ্গা-গড়া জীবন। সেখানে অবস্থিত নারীরা ছিল পরাধীন, তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার খোঁজ খবর নেওয়ার মানুষের ছিল অভাব। তাদের এই অন্ধকারময় জীবনে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় সত্যবতী। সত্যবতী চরিত্রের যে দৃঢ়তা, যুক্তিবাদী মানসিকতার স্থায়িত্ব পেয়েছে তা একমাত্র কারণ পিতা রামকালী। সন্তানের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি নির্ভর করে মাতা-পিতার ওপর। সেক্ষেত্রে সত্যবতীর চরিত্রে রামকালীর ছবি প্রতিনিয়তই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রশ্ন করার সাহস, কথা বলার ধরণ, অন্যায়ের প্রতিবাদ ইত্যাদি মানসিকতার মধ্যে রামকালীরই প্রভাব দেখা যায়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্যবতীর চরিত্রের দৃঢ়তা ও অভিজ্ঞতা আরোও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞানী, যুক্তিসম্পূর্ণ, আত্মমর্যাদাবোধপূর্ণ, ব্যক্তিত্ব রামকালী। তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার একটি অন্যতম উদাহরণ। সেই সময়ে পুরুষদের মধ্যে এতটা উন্নত মানের মানসিকতা খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। রামকালী প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় চলতে থাকা নানান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। তাইতো তিনি ঠাকুরকে জল না দেওয়া নিয়ে পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়দের অত্যাচারে অনায়াসে ঘর ছাড়তে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও কবিরাজি করতে কখনোই দ্বিধাবোধ করেনি। সবসময়ই তাঁর হাত এগিয়ে এসেছে অন্যের উপকার করার জন্য এবং এই সবগুলোই গুণ সত্যবতী চরিত্রের মধ্যেও অবস্থিত।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দৃষ্টিকটু দৃশ্য দরজার শেকল নাড়া অর্থাৎ বাইরের জগৎ ও অন্তঃপুরের জগতের যোগসূত্র স্থাপনের এটি ছিল অন্যতম প্রথা এবং এই প্রথা উলঙ্ঘন করার মতো সাহস একমাত্র সত্যবতীর মধ্যে দেখা যায়। বাইরের জগতের সঙ্গে অবাধে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারা একমাত্র উপায়ই ছিল তা। সত্যবতীও সেই প্রথাকে অনুসরণ করেছিল কিন্তু তাতে বেশি সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। স্বামী পুত্র নিয়ে কলকাতায় বসবাস করা কালীন ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন সেই কড়া নাড়তে ভুলে যায় এবং নিজেই বলে ওঠে- ‘আপনি আর কত কষ্ট করবেন?’^৬

এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কঠিন ও গুরুতর সমস্যা ছিল সমাজের দুপক্ষ নিয়ম। যেখানে দাঁড়িয়ে নারীর শালীনতা, চরিত্র, সতীত্ব নিয়ে ছিল কঠোর বিরোধিতা। কিন্তু অপরদিকে পুরুষদের এইসব আচরণ অতি সামান্য ও স্বাভাবিক বলে গণ্য হতো। নারীদের স্বাধীনতার লেশমাত্র ছিলনা। সমাজের এই দ্বিমুখী ভাবধারার বিষয়েতীব্র বিরোধিতা করেছিল সত্য। পিতাতুল্য শশুরের রাতে বাগদিপাড়া যাওয়ার ঘটনাকে তীব্র কটাক্ষের দৃষ্টিতে দেখেছিল সে। শশুরের এমন চারিত্রিক গুণ কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি সে। যা তার ভাবনারও অতীত ছিল তা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে নিত্য দিনের ঘটনা, যার তীব্র বিরোধিতা করে সে ঘর ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়-এখানেই তার মধ্যে স্বাধীন চেতনা, নারীমুক্তির ভাবধারা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

সেই সময়সীমার অন্তর্গত নারীদের জীবন যেইখানে খাঁচায় বন্দী সেইখানে দাঁড়িয়ে সত্য পুলিশের কাছে চিঠি লেখে এবং এনকোয়ারির জন্য সত্যকে নিতেও চলে আসে পুলিশ। নারীর জীবন যে মূল্যহীন নিতাইয়ের বউ ভবানীর বোনের শোচনীয় অবস্থা থেকে অনায়াসে ধরা পড়ে। স্বামী ও শাশুড়ির নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল তাকেও শেষঅবধি নৃশংসভাবে হত্যাও হয়েছিল তার।

তৎকালীন সমাজে নারীর একমাত্র অস্তিত্ব ভরসা হচ্ছে নিজের স্বামী। যদি কোন স্ত্রীর স্বামী না থাকে অর্থাৎ বিধবা নারীদের জীবনের ছিল চরম দুঃখ। কটোয়ার বউ শঙ্করীর জীবনেও নেমে এসেছিল চরম বিপদ। অতি কম বয়সে বিধবা হয়ে নিজের কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষেরমনে আকাঙ্ক্ষার ঘর বাঁধা স্বাভাবিক ব্যাপার, সেই সুত্রে শঙ্করীও অতি সহজেই সে মৃত স্বামীর ঘর ত্যাগ করে প্রেমিক নগেনের জন্য-তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে ঘর ছাড়ার মধ্য দিয়ে শঙ্করী নিজের সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যে লিখন তাকে সেই সুখ টুকু ভোগ করতে দেয়নি। নগেনের ছল চাতুরির শিকার হতে হয় তাকে এবং তাদের সম্পর্কের ফলস্বরূপ তার জীবনে নেমে আসে ট্রাজেডি। এতে তার সামাজিক সংকট আরোও গভীরভাবে দেখা যায় সুহাসিনী জন্মের মধ্যে দিয়ে। সে যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পায় নিজেরই ওই কিশোরী মূর্তি,তাই নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া মুহূর্তগুলি আবারও যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য সব সময় চিন্তিত সে। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যেক মায়েরই মনের রয়েছে নানান চিন্তা, যেখানে বাবা বলতে কোন চিহ্নই জীবনে নেই। কিন্তু সত্যর মতো দৃঢ় মেয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে শঙ্করী নিশ্চিত। সত্যর কাছে মেয়েকে সঁপে দিয়ে চিরশান্তিতে জন্মের মতো ঘুমিয়ে পড়ে সে। মাতৃহারা মেয়ের জীবন যে রক্ষতা নেমে আসে তা একমাত্র দূর করতে পারে শিক্ষা যা সত্যবতীর উদ্যোগে দেখা যায়। সত্যবতী নিজের জীবনের আত্মমুক্তির পাশাপাশি সুহাসের জীবনও পাল্টে দেয়। পরবর্তীতে সুহাসিনীকে দেখা যায় শিক্ষিকা হিসেবে। এখানে কেবলমাত্র নারী শিক্ষা ব্যাপারটি উঠে এসেছে সেটি নয় এর পাশাপাশি শিক্ষা কিভাবে নারীর জীবনের অসহায়তাকে দূর করে সেই বিষয়ও ফুটে উঠেছে। মার জীবনে যে অসহতা ছিল তা মেয়ের জীবনে শিক্ষাই সব পরিবর্তন ঘটায়। এখানে সুহাস এর মধ্যে আত্মমুক্তি, নারী জাগরণ ভাবধারার বিকাশ ঘটে। শিক্ষায় পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। সত্য সেই বন্ধ সমাজে তারা খুলতে পেরেছিল একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। কারন এইটিই অত্যন্ত দরকারি, নারী জাগরণে অন্যতম বিষয় ও একমাত্র উপায় বলা যেতে পারে। তৎকালীন সময়ের গৃহবন্দী নারীরা নিজেদের ঘরকন্নার কাজে প্রতিনিয়তই ঠেলে দিচ্ছিল নিজেদের, তাদের ভাবনারও উদ্দেশ্য ছিল যে এর পরিবর্তেও কোন কাজ হতে পারে যা তার জীবনকেই পাল্টে দিতে পারে। তবে এই পরিবর্তনের মূলে ও সমাজের মুক্তিদাতা হিসেবে আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতীকেই বেছে নিয়ে নারীর মুক্তির কাজে লাগিয়ে দেন। এবং এই মুক্তি প্রথম সত্যর জীবনের প্রবেশ করে যখন সে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে

কলকাতায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। কলকাতায় এসে যেন তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়, বাঁচার এক নতুন রাস্তা সে খুঁজে পায়। ভবতোষ মাষ্টারের কাছে আগে নিজে পড়াশুনা শিখে এবং তা পরবর্তীতে বিভিন্ন জনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। গুরুকে গুরুদক্ষিণা সরুপ ‘সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠ’^৭ খুলে সেখানে বৌ-ঝিদের সুশিক্ষিত করার মতো পুণ্যের কাজে যোগ দেয়। কিন্তু এই পুণ্য হতে হবে লুকিয়ে লুকিয়ে, কারণ সত্য তো মেয়ে এবং মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে শিক্ষা দান করার অধিকার সেই সমাজ ব্যবস্থা তখনও নারীদের দেয়নি।

যাইহোক, সত্যবতী চরিত্রের এই অসাধারণতা কেবল তাকে শিক্ষা গ্রহণকারী হিসেবে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি বরং সে সমাজে নারী জাগরণের অন্যতম ভূমিকা পালনের অধিকারী। শিক্ষার মাধ্যমে নিজে শিক্ষিত হয়ে সমাজে নারীদের শিক্ষিত করার দায়ভার গ্রহণ করে সে এইভাবে –

অশিক্ষিত->শিক্ষালাভ->জ্ঞান ও আত্মসচেতনতা->অন্যকে শিক্ষা দেওয়া->নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা

যে সমাজ নারীর শিক্ষার প্রতি তীব্র বিরোধী সেই সমাজে দাঁড়িয়ে সত্যবতী এক নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করে যার মূল সুর ছিল নারীর জাগরণ এবং এই সূত্র ধরেই সে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে নারীকে নিয়ে যেতে মুখ্য নিদর্শন হিসেবে কাজ করেছে- এই কাজ আশাপূর্ণা দেবীর কলমেই সম্ভব যার সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস বিষয়ে মন্তব্য করেছেন-

‘মহিলা গুণান্বিত এক শ্রী তাঁর উপন্যাসের বর্ণনা রীতিতে, সংলাপদক্ষতায়, ঘটনা-বিন্যাসে বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’-তে সেই সমস্ত গুণাবলী সুসমন্বিত। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখিকার কাল-চেতনা, কালের রূপান্তর সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি’^৮

সুতরাং ক্রমবিকাশ ও সামাজিক মানসিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর আত্মজাগরণ সম্ভব, এ কোনো বিস্ময়কর ও আকস্মিক ঘটনা নয়। যা আমরা কুসংস্কার, প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষা ও সামাজিক পরাধীনতার অন্ধকার থেকে শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে নারীর আত্মসচেতনতা, সেই আত্মসচেতনতা থেকে বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা— সত্যবতীর যাত্রাপথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এই ধারাবাহিকেই তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। তাঁর জীবন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে নারীর প্রকৃত মুক্তি কেবল ঘরের চার দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসার মধ্যে নয়; বরং নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করা, জীবনকে উপভোগ করা, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, শিক্ষা অর্জন করা, এবং নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জনই আত্মমুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে সত্যবতী ভাবিত হয়েই তার নিজের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা জাগ্রত করে যা ব্যক্তিগত বিদ্রোহের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর নারীজাগরণের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। একদিকে সমাজে চলতে থাকা নানা সমস্যা, পরাধীনতার করুন বাস্তবতা অন্যদিকে প্রকৃত শিক্ষা ও সচেতনতার মধ্য দিয়ে নতুন জীবন নির্মাণের সম্ভাবনা-গৃহবন্দী নারীর আত্মজাগরণ সত্যবতীর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে প্রথম। আশাপূর্ণার লেখনিতে নারীর জীবনসংগ্রাম, নারীর আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা, শিক্ষা, স্বাধীনতা ও আত্মমুক্তির দীর্ঘ অভিযাত্রার এক তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যিক দলিল হিসেবে বিবেচিত সত্যবতী চরিত্রটি।

তথ্যসূত্র:

১. দেবী, আশাপূর্ণা। প্রথম প্রতিশ্রুতি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আশিতম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪৩২, কলকাতা, পৃ: ভূমিকা।
২. তদেব, পৃ: ২২।

৩. তদেব, পৃ: ৩৬।
৪. তদেব, পৃ: ১২৪।
৫. তদেব, পৃ: ৩৫।
৬. তদেব, পৃ: ৩০৩।
৭. তদেব, পৃ: ৩৮০।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ: ৩০৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দেবী, আশাপূর্ণা। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আশীতম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪৩২ কলকাতা।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।